ভারতীয় বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশল

সিপিআই (মাওবাদী)

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ-এর সর্বজনীন সত্যকে আমাদের দেশের বিরাজমান বাস্তব পরিস্থিতিতে সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করে ভারতীয় বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশল সূত্রায়িত করতে হবে।

...ভারতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনৈতিক রণনীতি হলো, এই দেশকে যা আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক অবস্থানে রেখে দিয়েছে এবং যার ভারে ভারতীয় জনগণের পিঠ বেঁকে গেছে, সেই তিন বৃহৎ পর্বতকে উৎপাটন করার জন্য সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে দেশের সুবিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, জনসংখ্যার প্রায় নব্বই শতাংশ সেই সমস্ত মূল শক্তিকে, অর্থাৎ সর্বহারা, কৃষক, বিশেষত ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করা।

...ভারতীয় বিপ্লবের রণনীতি দেশের সর্বত্র এক হলেও অসম অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ, জনগণের সংগ্রামী মানসিকতা ও সচেতনতার স্তর এবং আন্দোলনের জোয়ার-ভাটা বিভিন্ন অঞ্চলে, নির্দিষ্ট সময়ে, অবশ্যই রণনীতির অধীনে, বিভিন্ন রণকৌশল অনুসরণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

বিপ্লবের কেন্দ্রীয় কর্তব্য—
দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল

কমরেড মাও বলেছিলেন, "সশস্ত্র শক্তির সাহায্যে ক্ষমতা দখল, যুদ্ধের মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি, বিপ্লবের কেন্দ্রীয় কর্তব্য এবং বিপ্লবের সর্বোচ্চ পর্যায়। মূল নীতি এক থাকলেও (সব দেশের ক্ষেত্রে), সর্বহারাশ্রেণীর পার্টি কর্তৃক তার প্রয়োগ, পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে বিভিন্ন পন্থায় ঘটে থাকে।"

ভারতীয় বিপ্লবের ক্ষেত্রেও উক্ত মূল নীতি প্রযোজ্য। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলই ভারতীয় বিপ্লবের কেন্দ্রীয় কর্তব্য। কেন্দ্রীয় কর্তব্য সম্পাদনের জন্য, ভারতের জনগণকে গণফৌজে সামিল করতে হবে এবং প্রতিবিপ্লবী ভারতীয় রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীকে মুছে ফেলতে হবে এবং তার পরিবর্তে তাদের নিজেদের জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের, বিশেষত রাশিয়া ও চীনের দুই মহান সর্বহারা বিপ্লবের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অধ্যয়ন ভারতের সর্বহারা পার্টির পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। ...ভারত ও প্রাক-বিপ্লব চীনের পরিস্থিতির মধ্যে মূলগত সাযুজ্য থাকায় চীনের বিপ্লবের পথ আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভারতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কৃষকদের বিপুল গরিষ্ঠাংশ তাদের জীবনযাপনের জঘন্য, বিশ্রী, আধা-সামন্ততান্ত্রিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য কৃষি বিপ্লবের জরুরি তাগিদ অনুভব করছে। ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লব এখনও অসমাপ্ত এবং ভূমি সমস্যার সমাধান হয় নি। অতএব, জমির জন্য কৃষকদের যুদ্ধ হলো নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মর্মবস্তু এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা এমন একটা বিষয় যেটা বিপুল কৃষক জনতাকে উদ্বুদ্ধ করতে ও গণফৌজে সামিল করতে পার্টি সফল ভাবে ব্যবহার করতে পারে।

...ভারতের অসম বিকাশ ইঙ্গিত করে যে, সারা দেশে এক সঙ্গে বিপ্লব (অর্থাৎ সশস্ত্র অভ্যুত্থান) করা সম্ভব নয়। গ্রামাঞ্চলের তুলনামূলকভাবে অনুন্নত ও স্ট্র্যাটেজিক এলাকাকে ভিত্তি করে দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের রণনীতির মাধ্যমে আঞ্চলিক ক্ষমতা দখলের কর্মসূতি গ্রহণ করতে হবে। তার অর্থ, যে সমস্ত এলাকা তুলনামূলকভাবে পশ্চাদপদ এবং যেখানে সামাজিক সংঘাত তীব্র, সেই সব এলাকাতেই বিপ্লবী যুদ্ধ শুরু করতে হবে। ...

দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ চলাকালীন পর্যায়ে আমাদের আরও অনেক বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং গেরিলা অঞ্চলের বিকাশ ঘটিয়ে আমাদের উচিত মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা, তবে এটা মাথায় রাখতে হবে যে একনাগাড়ে মুক্তাঞ্চল গঠন সম্ভব নয়। শ্রেণী নীতি ও গণ নীতির ভিত্তিতে, আরও দক্ষতার সঙ্গে এবং সতর্কভাবে জনগণকে শ্রেণী সংগ্রামে সমাবিষ্ট করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, শত্রুপক্ষের একটিই বাড়তি সুবিধা (যদিও স্বল্পকালীন) আছে, শক্তির বিচারে, রাষ্ট্রযন্ত্র, বিশেষত বেতনভোগী সশস্ত্র বাহিনী, উন্নততর ক্ষমতা ধরে।

সংসদীয় নির্বাচন— আমাদের অবস্থান

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনুসারে, নির্বাচনে অংশ নেওয়া ও তা বর্জন করা সংগ্রামের রূপ এবং তা রণকৌশল সম্পর্কিত বিষয়। কিন্তু ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদ আবির্ভূত হওয়ার পর যখন সংসদীয় পথ এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ আধুনিক সংশোধনবাদীদের রণনীতি হয়ে দাঁড়ালো, তখন, এই মনোভাবের প্রেক্ষাপটে আমরা এই বিষয়টাকে কেবলমাত্র রণকৌশলগত বিষয় হিসাবে এড়িয়ে যেতে পারি নী। সুতরাং, এটা বলা ভুল যে অন্যান্য রণকৌশলের মতো এই রণকৌশলও যদি সাধারণভাবে দেশের বাস্তব পরিস্থিতি এবং বিপ্লবী রণনীতি, যথা দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল-এর সঙ্গে খাপ খায়, তবেই ব্যবহার করা যেতে পারে।

আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভারতবর্ষের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, যেখানে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবও সমাধা হয়নি, এবং অসম সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজমান, সেখানকার বস্তুগত পরিস্থিতি, সর্বহারা শ্রেণীর পার্টিকে, বিশাল গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার ও জারি রাখার অনুমোদন দেয়। সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতির নামে নির্বাচনে অংশগ্রহণ, বিপ্লবী সংগ্রামে অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করবে। অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশ, যেখানে বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থান যেখানে বিপ্লবের পথ, তার বিপরীতে ভারতবর্ষে শান্তিপূর্ণ সময়ে বিপ্লবের প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। অতএব, সাধারণভাবে বলতে গেলে, আমাদের দেশে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশে কোনও সাহায্য করবে না, জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধিতে কোনও কাজে দেবে না। বরং তা পার্টির বিভিন্ন স্তরে এবং সাধারণভাবে জনগণের মধ্যে সাংবিধানিক মোহ এবং বৈধ প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেবে। ভারতবর্ষে বিপ্লবী পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং বিপ্লবের পথ হলো দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ। বিপ্লবের জোয়ার-ভাটার সঙ্গে সংসদে অংশগ্রহণের কোনও সম্পর্ক নেই। সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করা যেতে পারে এবং গ্রামাঞ্চলে এলাকা ভিত্তিক ক্ষমতা দখল সম্পন্ন করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, সংসদে অংশগ্রহণ নেতৃত্বদায়ী শক্তির বিকাশে সাহায্য করে না। বরং এর ফলে তারা বৈধ সংগ্রাম-সর্বস্বতার দিকে ধাবিত হয় এবং গোপন পার্টি গঠনের, বিপ্লবী শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্রতর করার ও রাষ্ট্রে বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কষ্টকর ও শ্রমসাধ্য কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়।

ভারতীয় জনসাধারণের সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি মোহ আছে এবং এই মোহমুক্তির জন্য সংসদীয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন— এটা আরও বিরক্তিকর ও মারাত্মক যুক্তি। সংসদীয় প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবস্থা জনগণের চোখে অনেকখানি অবিশ্বাস অর্জন করেছে এবং এতে অংশগ্রহণ করলে জনগণের মধ্যে বিভ্রম সৃষ্টি করবে অথবা বিভ্রম বৃদ্ধি করবে। ভারতবর্ষে সংসদীয় ব্যবস্থার অভ্যন্তরে থেকে তার স্বরূপ উন্মোচন করার কোনও বস্তুগত ভিত্তি নেই। এটা সব থেকে ভালোভাবে করা যেতে পারে সরাসরি প্রচার এবং নির্বাচন বর্জনের শ্লোগানের ভিত্তিতে সংসদীয় ও নির্বাচনী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করে।

আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে নির্বাচনে যদিও রণকৌশলের বিষয়, কিন্তু যেহেতু দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের রণনীতির সঙ্গে তা আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, সেই হেতু তা ভারতের নির্দিষ্ট পরিস্থিতি রণনীতির তাৎপর্য অর্জন করেছে।

...জনযুদ্ধের একেবারে সাধারণ নীতি বলে যে, বিপ্লবের বর্তমান স্তরের মূল, প্রধান ও আশু কর্তব্য হলো গ্রামাঞ্চলে, বিশেষত দুর্গম গ্রাম অঞ্চলে (যেখানে গেরিলা যুদ্ধ, গণফৌজ ও ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক) সুপরিকল্পিতভাবে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে গণফৌজ ও লাল ঘাঁটি এলাকা গঠন করা।

...“কৃষকের হাতে জমি”, “কৃষক সমিতিগুলির হাতে সমস্ত ক্ষমতা”, “ক্ষমতা না পেলে জনগণের কিছুই নেই” ও “গণফৌজ না থাকলে জনগণের কিছুই নেই”— এই শ্লোগানে প্রথম থেকেই আমাদের জনতাকে সংগঠিত করতে হবে। এই শ্লোগান ও সংগ্রামের রূপের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য, আমাদের এই সমস্ত সামরিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় প্রথম থেকেই কৃষকদের সশস্ত্র সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। নব্বই দশকের গোড়ায় আমাদের দেশে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা ছিলে ২.৬ কোটি। অসংগঠিত ক্ষেত্রে, সহায়ক ও ক্ষুদ্র শিল্পে, শ্রমিকের সংখ্যায় ছিলো এর দ্বিগুণ, ৪.৫ থেকে ৫ কোটি। সেই কারণে, বিপ্লবী পার্টি শহরে ও শিল্পাঞ্চলে কাজকর্ম আর অবহেলা করতে পারে না এবং প্রাক-বিপ্লব চীনের তুলনায় এটা অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করে। কিন্তু বুর্জোয়া ও সংশোধনবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলি কয়েক দশক ধরে যে ধরনের আন্দোলন চালিয়ে এসেছে, তার ফলে শ্রমিকদের অধিকাংশ অর্থনীতিবাদের পাঁকে আবদ্ধ হয়ে আছে। তা সত্ত্বেও শ্রমিকরা বেশি বেশি করে স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামে অংশ নিচ্ছে, এবং তাদের স্ব স্ব ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃত্ব সম্পর্কে মোহমুক্ত হচ্ছে। তাদের সঠিক পথে চালিত করার ও সংগঠিত করার দায়িত্ব একমাত্র বিপ্লবী পার্টির ওপরই বর্তায়।

Õ±ý×¿ò Ý ÎõÕ±ý×¿ò ßÂ±ûÇßÂù±ËÂóõþ ü÷¡¤ûþ

আইনসঙ্গত ক্রিয়াকলাপ এবং গোপন পার্টির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা বিপ্লবী পার্টির কর্মকাণ্ডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। পার্টির সর্বস্তরের সভ্যদের এর কলাকৌশল নিপুণভাবে আয়ত্ত করতে হবে। ঠিকঠাক বলতে গেলে, আইনি ও বে-আইনি সংগঠন ও কার্যক্রমের সমন্বয় প্রসঙ্গে বিপ্লবীদের যথেষ্ট বিভ্রান্তি রয়েছে এবং তারা প্রচুর ভুল করে। সকল বিপ্লবের ক্ষেত্রেই এটা ঘটেছে এবং লেনিন দেখিয়েছিলেন, গোপন পার্টির ও সমাজ গণতন্ত্রী বৈধ কার্যকলাপের সমস্যা কীভাবে রাশিয়ার অন্যতম প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এক্ষেত্রে আমাদের দেশের বিশেষ অবস্থায় যেখানে সত্যকার গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা নেই, রাশিয়ার অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করতে হবে।

শ্রেণীনীতি ও গণনীতি

...নকশালবাড়ি-পরবর্তী যে কৃষক আন্দোলনগুলি বিকশিত হয়েছিলো, সেগুলির সামরিক ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হলো, প্রয়োগের ক্ষেত্রে শ্রেণীনীতি ও গণনীতি যথাযথ অনসরণ করার উপলব্ধির অভাব। এর থেকে নিশ্চয় শিক্ষা নিতে হবে। নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের স্বীকার না করে উপায় নেই। কিন্তু এটা পরিষ্কার ভাবে বোঝা দরকার যে, প্রকৃত অর্থে বিপ্লবী সংগ্রাম বা বিপ্লবী পার্টি কিংবা গণফৌজ, এর কোনটাই বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের একার দ্বারা গড়ে ওঠে না। প্রকৃত অর্থে বিপ্লবী যুদ্ধ, বিপ্লবের অস্ত্র প্রকৃত বিপ্লবী পার্টি, গণফৌজ ও যুক্তফ্রন্ট- এর কোনটাই, সমাজের সব থেকে বিপ্লবী ও বিপ্লবের প্রধান শক্তি শ্রমিক শ্রেণী এবং শ্রমিক শ্রেণীর সবথেকে নির্ভরযোগ্য মিত্র, ভারতীয় জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কৃষক, বিশেষত গরিব ও ভূমিহীন কৃষকদের সক্রিয় সমর্থন ও দৃঢ় অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে গঠন করা সম্ভব হত না।

গণসংগঠন ও গণ-সংগ্রাম

গণ সংগঠন বিপ্লবের জয়লাভের জন্য নিতান্ত অপরিহার্য। গণ সংগঠন গড়ার প্রধান লক্ষ্য, জনগণকে বিপ্লবের জন্য সংগঠিত করা। অসংখ্য সংগ্রামে জনগণকে সামিল না করলে এবং এইসকল সংগ্রামের পথে তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা উন্নত করতে না পারলে তারা শোষক শ্রেণীর রাষ্ট্র উচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারবে না এবং বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্টি জনগণকে বিপ্লবের বিজয়ের পথে নেতৃত্ব দিতে পারবে না। এই কারণে সংশোধনবাদী নেতৃত্বে পরিচালিত গণ সংগ্রাম ও গণ-সংগঠনের মধ্যে এক পরিষ্কার লক্ষ্মণরেখা টানা নিতান্ত প্রয়োজন। ভারতবর্ষের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের রণনীতি অনুসারে গণ আন্দোলন ও গণসংগঠনের অভিমুখ রচিত হবে।

...সংগঠন ও সংগ্রামের রূপ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হবে। উপরন্তু, একই অঞ্চল, রাজ্য বা সামগ্রিকভাবে দেশের পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকে না, বরং ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়। সেই কারণে, সংগঠনের প্রকৃতি এবং সংগ্রামের রূপের অনুরূপ পরিবর্তনের প্রশ্ন সামনে এসে যায়। প্রত্যক অঞ্চল বা রাজ্যের ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি নির্দিষ্ট সময়ের ক্ষেত্রে সঠিক কৌশল রচনার জন্য এটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে গণ্য করা প্রয়োজন। সংগ্রামের রূপ এবং সংগঠনের প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি যদি গ্রহণ না করি, তাহলে আমরা সফল গণ সংগঠন ও শক্তিশালী গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হব।

গণ সংগ্রাম ও সশস্ত্র সংগ্রামের আন্তঃসম্পর্ক

গণ সংগঠন ও গণ সংগ্রামের গুরুত্ব স্বীকার করলেও, আমাদের মনে রাখতে হবে, সামগ্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামই হবে সংগ্রামের মূল রূপ এবং সংগঠনের মূল রূপ হবে সেনাবাহিনী।

কমরেড মাও দেখিয়েছিলেন, “...সংগ্রামের প্রধান রূপ যুদ্ধ এবং সেনাবাহিনী সংগঠনের প্রধান রূপ। অন্যান্য রূপ, যথা গণ সংগঠন ও গণ সংগ্রাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বস্তুত অপরিহার্য এবং কোন অবস্থাতেই উপেক্ষা করা যায় না, কিন্তু সে সবের উদ্দেশ্য হচ্ছে যুদ্ধকে সাহায্য করা। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে সব সংগঠন ও সংগ্রাম যুদ্ধের প্রস্তুতিতে... যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সব সংগঠন ও সংগ্রামগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুদ্ধের সঙ্গে সমন্বিত।”

এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। ভারতের বিপ্লবের ক্ষেত্রেও আমাদের পার্টি এটাকে একটা নির্দেশিকা হিসাবে গ্রহণ করেছে। ভারত এবং প্রাক-বিপ্লব চীনের বস্তুগত অবস্থার মধ্যে যে পার্থক্য থাকুক না কেন, গণ সংগ্রাম ও সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে সম্পর্কের অন্তর্নিহিত নীতি অভিন্ন। গণ সংগঠন ও গণ সংগ্রাম জনগণের সশস্ত্র বাহিনী বনাম শত্রু বাহিনীর যুদ্ধ শুরু হলে তাতে সাহায্য করবে অথবা তার প্রস্তুতির অভিমুখে কাজ করবে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, প্রকৃতি ও ক্রিয়াকলাপের ওপর নির্ভর করে গণসংগঠনগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়: (১) গোপন বিপ্লবী গণ সংগঠন — কঠোরভাবে গোপন থাকবে এবং পার্টির বিপ্লবী নীতি প্রচার করে জনগণকে সশস্ত্র সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করবে। (২) প্রকাশ্য অথবা আধাপ্রকাশ্য বিপ্লবী গণ সংগঠন— নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনীতি সম্পর্কে প্রকাশ্যে প্রচার করবে এবং জনগণকে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করবে। এই সংগঠনগুলি, বৈধ সমস্ত সুযোগ কাজে লাগিয়ে বিপ্লবী প্রচার ও আন্দোলন চালিয়ে যাবে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী শক্তিসমূহকে, যতটা বিস্তৃত সম্ভব, সমবেত করবে। এইভাবে

যতদিন খোলাখুলিভাবে বিপ্লবী কাজের সুযোগ থাকবে, ততদিন এই সংগঠনগুলিও প্রত্যক্ষভাবে জনযুদ্ধে সাহায্য করবে। বিপ্লবী মহিলা সংগঠন, বিপ্লবী ছাত্র ও যুব সংগঠন, বিপ্লবী শিল্প ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, বিপ্লবী লেখক সংগঠন, বিবিধ সম্প্রদায়ের নয়া গণতান্ত্রিক সংগঠন ইত্যাদি খোলাখুলি বিপ্লবী প্রচার ও আন্দোলন করার নিমিত্তে গঠন করা যেতে পারে। (৩) পার্টির সঙ্গে সম্পর্কহীন গণ সংগঠ— পার্টির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্করহিত এই সংগঠনগুলি অন্য কোনও বিষয়ের অ াড়ালে কাজ করে। এই উদারমতাবলম্বী সংগঠনগুলি পার্টি-বহির্ভূত শক্তিগুলিকে এক সাধারণ কর্মসূচিতে সামিল করার চেষ্টা করে। এরা প্রকাশ্যে সাম্রাজ্যবাদ সা মন্ততন্ত্র বিরোধী কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে অথবা আরও সীমাবদ্ধ কর্মসূচি নিয়েও কাজ করতে পারে। রাষ্ট্রের নিপীড়ন যখন চরমে পৌঁছায়, তখন প্রকাশ বিপ্লব ী সংগঠনগুলির সুযোগ অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, তখন এই সংগঠনগুলি অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

...শহরাঞ্চলের অন্দোলন প্রধান উৎস, যেখান থেকে কর্মী ও নেতৃত্ব জনযুদ্ধ ও মুক্তাঞ্চল গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকুশলতার সাহায্য পায়। এখানকার শিল্প শ্রমিকদের, বিশেষত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে যখন আন্দোলন চলে, আমরা বিভিন্ন প্রচারের মাধ্যমে বাইরে থেকে তাকে প্রভাবিত করতে পারি। বৈধ ট্রেড ইউনিয় ন সংগঠন, শ্রমিকদের পত্রিকা, গোপন প্রচারপত্র এমন কি পার্টি বিবৃতির মাধ্যমেও এগুলো করা যেতে পারে... শহরে গণরাজনৈতিক সমাবেশ ও সংগঠিত করা র মূল লক্ষ্য শ্রমিকশ্রেণী। ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিক শ্রেণীর অন্যান্য সংগঠনগুলির প্রতি আমাদের বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। বস্তি অঞ্চলকেও, যেখানে শহু র গরিবদের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর বসবাস, আমাদের সংগঠিত করতে হবে।